KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

আদি বাংলার তাম্রপট্টের নিরিখে ভূমিরূপের বর্ণনা
(খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক)

মুন্না রজক
পি.এইচ.ডি গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত নিবন্ধের উদ্দেশ্য বাংলার তাম্রপট্টের নিরিখে ভূমিরূপ এবং গ্রামীণ বসতির ভৌগলিক চরিত্র সংক্রান্ত একটি সার্বিক চর্চা। প্রসঙ্গত তাম্রশাসন গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিদান সংক্রান্ত দলিল এবং এগুলিতে প্রদত্ত ভূমির সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে নানা ভূমিরূপ সংক্রান্ত উপাদান গুলির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কাজেই লেখতে ভূমির সীমানার নির্ধারক হিসাবে উল্লেখ করা- গ্রামীণ জনবসতি, পাহাড়, পর্বত, উচু বা নিচু জমি, জলীয় ভূপ্রকৃতি, রাস্তা , বাঁধ, জঙ্গল, গাছ, ইত্যাদি নানান ভূমিরূপগত উপাদানগুলি কার্যত হয়ে ওঠে ওই স্থান বা অঞ্চলটির ভূমিরূপগত ধারণারও দ্যোতক। এই ভূমিদানপট্টে ভূমিরূপের বিভিন্ন উপাদান এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং তা গ্রামীণ জনবসতির ধরণকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং কিভাবে মানুষের সাথে ভূমিরূপের পারস্পরিক আদান-প্রদান পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, সে প্রসঙ্গও এখানে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আলোচ্য সময়পর্বে তাম্রশাসনে দানকৃত ভূমির বিবরণের মধ্যে যে প্রকার ভূমির বিবরণ রয়েছে তার মধ্যেও কি কোন রকম পরিবর্তন পাচ্ছি তা বোঝারও চেষ্টা করছি। দরবারী সংস্কৃতির একটি অংশ হল ভূমিদান প্রক্রিয়া। আমরা পুরোপুরি ভাবে এই সংস্কৃতিতে উচ্চ সংস্কৃতি দেখি বা দেখার চেষ্টা করি। এখানে কিন্তু এমনটা নয় এখানে আমরা মাটির জগৎ, প্রতিদিন মানুষের নিত্য-নিয়মিত তাগিদের সাথে, জীবনের বেঁচে থাকার সাথে যুক্ত একটা জগৎকে দেখি, যা কিনা সামাজিক ও বৌদ্ধিক আদান প্রদানের একটা বিরাট জগৎ। সেই জগৎ এ তথ্যের আদান প্রদান। লেখমালায় সামাজিক ও বৌদ্ধিক স্তরে যে স্তর বিন্যস্ত পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয় তা থেকে এটা অনুমান করা যায় এই দুই জগৎ এর গুরুত্ব এখানে রয়েছে। ভূ-দলিলে মাটির কাছাকাছির বহু তথ্য যেভাবে ফুটে উঠেছে যা বিষয়টিকে আরও বেশি পরিষ্কার করেছে। স্থানীয় ভূমিরূপ, ভূমিবিন্যাস এবং গ্রামীণবসতি সংক্রান্ত মানুষের ধারণা রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আহরিত ও সংকলিত হয়ে স্তরে স্তরে পরিশীলিত সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানভাণ্ডারে সন্নিবিষ্ট হতে থাকে, যা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে স্থানীয় সমাজ ও অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

সূচকশব্দ- বাংলা, রাজবংশ, রাষ্ট্র, দরবারী সংস্কৃতি, ভূমিদান, ভূ-দলিল, ভূমিরূপ, গ্রামীণ বসতি।

বর্তমান নিবন্ধে উপাদান হিসাবে মূলত লেখগত উপাদান, বিশেষত তাম্রশাসন বা ভূমিদানপট্টের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রিচার্ড সলোমন[২] তার "ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি" নামক শীর্ষক গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে লেখগত উপাদানের এক সমীক্ষা করে এই লেখমালা গুলিকে দশটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন, এই বিভাগের তালিকায় দ্বিতীয়টি হল তাম্রশাসন বা দানমুলক লেখ। এখন প্রশ্ন হল বর্তমান গবেষণায় এই তাম্রপট্টগুলি গ্রহণের কারন কি ?

প্রথমত- ষষ্ট- দ্বাদশ শতাব্দীর তথা আদি- মধ্যুগীয় কাল পর্বের তাম্রশাসন গুলি অধীক সংখ্যায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত- তাম্রশাসন গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিদান সংক্রান্ত দলিল এবং এগুলিতে প্রদত্ত ভুমির সীমা

নির্ধারণ প্রসঙ্গে নানা ভূমিরূপ সংক্রান্ত উপাদানগুলির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কাজেই লেখতে ভূমির সীমাণার নির্ধারক হিসাবে উল্লেখ করা – গ্রামীণ জনবসতি, পাহাড়, পর্বত, উচু বা নিচু জমি, জলীয় ভূপ্রকৃতি, রাস্তা, বাঁধ, জঙ্গল, গাছ, ইত্যাদি নানান পরিবেশগত উপাদান গুলি কার্যত হয়ে ওঠে ওই স্থান বা অঞ্চলটির ভূমিরূপগত ধারণার দ্যোতক।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত আদি বাংলা (অধুনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সমূহ) ভূখন্ডের বিভিন্ন অংশ সীমানাগত পরিবর্তনের কারনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক পরিচিতিতে পরিচিত হয়েছিল। আদি বাংলার উপ-আঞ্চলিক ক্ষেত্র গুলি- বঙ্গ, বঙ্গাল, বাঙ্গালা, গৌড়, পুন্ড্র, সমতট, হরিকেল, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে[1] চিহ্নিত হয়েছে। কখনো কখনো উপ-অঞ্চলগুলি একে অপরের ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কখনো বা সময়ের পট পরিবর্তনের সাপেক্ষে লেখগত সূত্রে চিহ্নিত হয়েছে অন্য নামে। এই রাজ্যটির উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা হিমালয় অবস্থিত। পশ্চিম অংশে আছে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো মালভূমি অঞ্চল। এছারা বাকি অংশ জুড়ে নদনদীর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

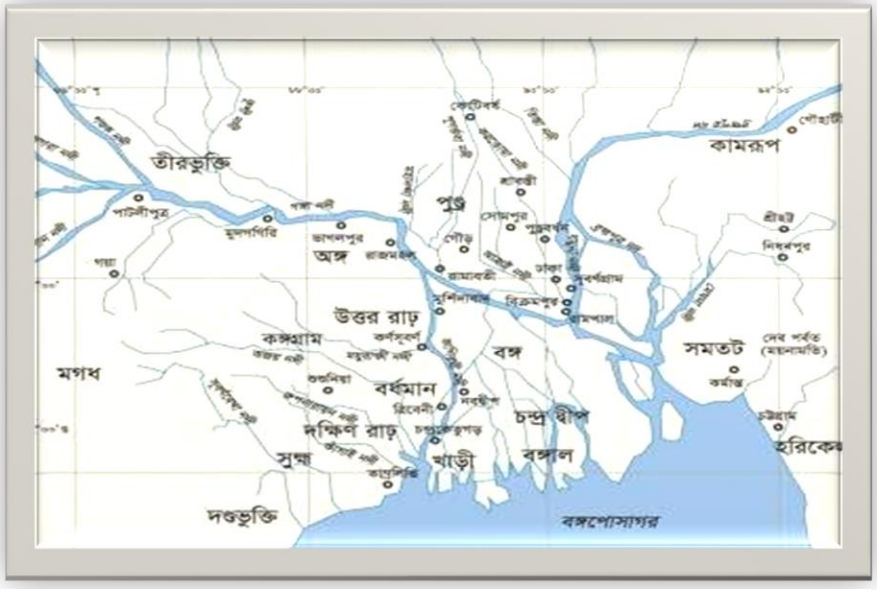

আদি বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান মানচিত্রের নিরিখে দেখানো হলো

বর্তমান সন্দর্ভের নির্বাচিত সময়পর্বে (খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক) আদি বাংলা ভূখন্ডের অংশ বিশেষে মূলত – পাল, সেন, চন্দ্র, ও বর্মনদের, আধিপত্য দেখা যায়। উক্ত রাজবংশ গুলির লেখমালা বা তাম্রপট্টের নিরিখে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার ভূপ্রকৃতিগত ভূমিরূপের আলোচনার প্রয়াস করা হল। আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে উক্ত রাজবংশ[2] গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

নবম-দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক রূপরেখা তুলে ধরতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'পাল' রাজবংশের কথা। যারা সময়ের সাপেক্ষে রাজনৈতিক, আঞ্চলিক সীমানার নিয়ত পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে অষ্টম, একাদ্বশ- দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভূখণ্ডের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম অংশ ছাড়াও বর্তমান বিহারের এক বড় অংশ জুড়ে যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় ছিল তা বলাই যায়। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের (সমতট) অংশ বিশেষেও যে পালদের আধিপত্য কিছু সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেখগত সাক্ষ্যে তার প্রমান মেলে। আবার পালদের প্রায় সমসাময়িক কালে নবম-একাদ্বশ শতকীয় কাল পর্বে পূর্ব ও দক্ষীণ-পূর্ব বাংলায় (বঙ্গ, সমতট, শ্রীহট্ট,) 'চন্দ্র' রাজবংশের ক্রমিক উত্থান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের ঘটনাও আঞ্চলিক

রাজনীতির সাপেক্ষে এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 'চন্দ্রদের' অব্যবহিত উত্তরসূরি হিসাবে প্রায় একই ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষীণ-পূর্ব বাংলার অংশে বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করে একাদ্বশ- দ্বাদশ শতকে অবস্থান করেছিল 'বর্মন' রাজবংশ । একাদ্বশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চল থেকে শুরু করে ক্রমে দ্বাদশ শতকে বাংলার প্রায় সমগ্র ভৌগোলিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অবশ্যই সেন রাজবংশই দাবি করে। সেন আমলেই প্রথম বাংলার বিভিন্ন উপঅঞ্চল গুলি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একক রাজনৈতিক শক্তির ছত্র ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পূর্ব- ভারতীয় ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলা ক্রমে এক অভিন্ন অঞ্চল হিসাবে উঠে আসে। খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের কাল পর্বে বাংলার- 'পাল[3]', এবং 'সেন' দের,[4] ১৬ টি তাম্রপট্টের বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভূমিরূপ সংক্রান্ত ধারণার উল্লেখ পাওয়া গেছে । উক্ত তাম্রপট্টের নিরিখে আদি বাংলার ভূমিরূপ সংক্রান্ত আলোচনায় অভীনিবেশ করা যাক।

লেখমালার নাম	শাসক	প্রাপ্তিস্থান	উল্লেখ
১. খালিমপুর তাম্রসাশন	ধর্মপাল	খালিমপুর জেলা	৯৫-১০৯
২. মুঙ্গের তাম্রপট্ট	দেবপাল	মুঙ্গের বিহার	১১৪-১৩০
৩. ভাগলপুর তাম্রপট্ট	নারায়ণ পাল	ভাগলপুর, বিহার	১৬৩-৮৩
৪. বাণগড় তাম্রপট্ট	প্রথম মহীপাল	দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ	১৯৭-২০৭
৫. নৈহাটি তাম্রপট্ট	বল্লাল সেন	বর্ধমান জেলা, নৈহাটি গ্রাম	৬৮-৮০
৬. অনুলিয়া তাম্রপট্ট	লক্ষণ সেন	অনুলিয়া, নদীয়া জেলা	৮১-৯১
৭. গোবিন্দপুর তাম্রপট্ট	লক্ষণ সেন	গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা জেলা	৯২-৯৮
৮. তর্পণদিঘী তাম্রপট্ট	লক্ষণ সেন	তর্পণদিঘী, দিনাজপুর জেলা	৯৯-১০৫
৯. এদিলপুর তাম্রপট্ট	কেশব সেন	এদিলপুর জেলা	১১৮-১৩১
১০. মাধাইনগর তাম্রপট্ট	লক্ষণ সেন	মাধাইনগর, পাবনা জেলা	১০৬-১১৭
১১. রামপাল তাম্রপট্ট	শ্রীচন্দ্র	পঞ্চসার গ্রাম, জেলা ঢাকা	১-৮
১২. বেলাব তাম্রপট্ট	ভোজবর্মন	বেলাব, ঢাকা জেলা	১৪-২৪
১৩. ব্যারাকপুর তাম্রপট্ট	বিজয়সেন	ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা জেলা	৫৭-৬৭
১৪. মদনপাড়া তাম্রপট্ট	বিশ্বরূপসেন	মদনপাড়া, জেলা ফরিদপুর	১৩২-১৩৯
১৫. রামগঞ্জ তাম্রপট্ট	ঈশ্বর ঘোষ	রামগঞ্জ, দিনাজপুর জেলা	১৪৯- ১৫৭
১৬. চিট্টগং তাম্রপট্ট	দামোদর	নাসিরাবাস, চিট্টগং শহরের কাছে	১৫৮-৬৩

জলীয় ভূপ্রকৃতি প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য নদ-নদীর প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত বিশেষ ভাবে পূর্ব এবং দক্ষিণ- পূর্ব বাংলার, এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে আদ্র মৃত্তিকার উপস্থিতি এবং জলীয় ভূমিরূপের প্রাধান্য বা আধিক্য সর্বজন বিধিত । সেহেতু বাংলার বিভিন্ন লেখতে – কৃত্রিম নালা, 'খাটীকা'[5] (খাত), 'জলপিল্ল', 'জোলক', 'আলি', 'স্রোত', 'জলাশয়' ইত্যাদি নানা ধরনের জলক্ষেএ এবং তার পাশাপাশি বহু ধরনের বৃক্ষকে ভূমি সীমানা নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। আলোচ্য পর্বের নির্বাচিত লেখমালা গুলিতে ৬টি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হল – 'গঙ্গা', 'ভাগিরথি', 'কোঙঠিয়া[6]', 'সিঙ্গটিয়া[7]', 'নর্মদা', 'যমুনা'। এর মধ্যে নর্দমা এবং যমুনা যেহেতু 'যদু' এবং 'ভোজদের' অবস্থান বোঝাতে গিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং কোনভাবেই বাংলা ভূমিরূপের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই এই দুটি নদীকে আলোচনার বাইরে রাখা হল।

জলীয় ভূপ্রকৃতির প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় পালরাজা ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রশাসনের' কথা। যেখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে ৪টি গ্রামদানের কথা বলা হয়েছে। যাদের প্রতিটি সীমারেখাতে নদী, গঙ্গিনিকা, জোলক[8], এবং খাটীকা, এই বিবিধ প্রকার জলধারার প্রতক্ষ অনুষঙ্গ চোখে পড়ে। ব্যঘ্রতটী মণ্ডলের মহান্তা প্রকাশ বিষয়ে দান করা হয়েছে ৩টি গ্রাম যথা- ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, মাঢাশাম্মলী, পালিতক, এর মধ্যে ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রামের পশ্চিমে গঙ্গিনিকা, উত্তরে কাদম্বরির ছোট মন্দির এবং একটি খেজুর গাছ। উত্তর-পূর্বে রাজপুএ দেবতার নির্মিত 'আলী'[9] (যা লেবু বাগানে প্রবেশ করেছে) এবং পূর্বে ' বীটক আলীর' উপস্থিতির দ্বারা সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। একটি গ্রামের চতুঃসীমায় (একটি গঙ্গিনিকা, একটি জোলক, এবং দুটি আলি) এবং তিন প্রকারের ৪ টী জলধারার উপস্থিতি থেকে সহজেই স্থানীয় ভূগোলে জলীয় ভূমিরূপের গুরুত্ব অনুভূত হয় । আবার মাঢাশাম্মলী গ্রামের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এর সীমা সংলগ্ন এলাকায় দুটি 'স্রোতিকা' এবং একটি 'গঙ্গিনীকার' উল্লেখ রয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মাঢাশাম্মলী' গ্রামের পূর্ব সীমাস্থিত জলধারাটিকে বোঝাতে 'আর্দ্দস্রোতিকা' শব্দটি ব্যবহিত হয়েছে। ক্ষেত্রে একটি স্রোতিকা বা জলধারার 'আর্দ্দ' বিশেষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় মনে হয় জলযুক্ত স্রোতিকা, নদী, নদীখাতের পাশাপাশি স্থানীয় ভূমিরূপে কিছু শুষ্ক বা জলহীন স্রোতিকা বা স্রোত থাকতে পারে তা অনুমেয়। তবে নদীখাতের অস্তিত্ব অজানা ছিল না। একই ভাবে পালিতক গ্রামের পূর্বে ও উত্তরে রয়েছে যথাক্রমে 'কোঙঠিয়া'[10] নদী ও একটি 'গঙ্গিনীকা'। উক্ত গ্রাম তিনটি যেহেতু একটি মণ্ডল ও একই মণ্ডলের একই বিষয়ের অর্ন্তভুক (যদিও গ্রাম তিনটি পরস্পর সংলগ্ন কিনা তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ নেই)। সেহেতু বর্তমান উত্তরবঙ্গের এবং তার নির্দিষ্ট এলাকাটিতে যে জল সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং তার স্থানিয় ভূমিরূপে জলীয় ভূপ্রকৃতির বিশেষ উপস্থিতি ও গুরুত্ব ছিল তা বোঝা যায়। একই লেখতে 'পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির' আম্রশন্ডিকা মণ্ডল ও স্থালিক্কট বিষয়ে প্রদত্ত অপর একটি গ্রামে 'গোপিপ্পলি সীমানার বর্ণনায় স্পষ্টই দেখি গ্রামটির পূর্ব ,দক্ষীণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমানায় রয়েছে যথাক্রমে 'উদ্রগ্রামমণ্ডল' একটি 'জোলক', 'বেসনিকা' নামক একটি 'খাটিকা'[11] বা খাত । উদ্রগ্রামমণ্ডলের সীমানা বরাবর বিস্তৃত একটি গোপথ। এ থেকে আবারও দক্ষিণ পশ্চিমে দুই জলধারা (একটি 'জোলক', 'বেসনিকা' নামক একটি খটিকা) দ্বারা বেষ্টিত এক গ্রামীণ ভূপ্রকৃতির ছবি ফুটে ওঠে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অপর এক স্থানীয় মানচিত্রে ।

অন্যদিকে 'স্কন্দাবার', 'পাটুলিপুত্র' (খালিমপুর তাম্রপট্ট) এবং 'মুদ্গাগিরির[12]' (মুঙ্গের, ভাগলপুর তাম্রপট্ট) বর্ণনায় যেভাবে সংলগ্ন ভাগীরথীর এগিয়ে চলা নৌসমারোহের কাব্যিক চিত্র ফুটে ওঠে তা একাধারে নিম্ন প্রবাহে ভাগীরথী তথা গঙ্গা নদীর বিস্তৃতি ও তার নাব্যতা নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে নদী পথে ব্যপক নৌ কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি আর্থ সামাজিক সজীবতার প্রচ্ছন্ন অনুষঙ্গকে তুলে ধরে। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির রাজনৈতিক কেন্দ্র 'পাটুলিপুত্রে' এবং 'মুদ্গাগিরির' পরিবেশগত ভূমিরূপে ভাগীরথী তথা গঙ্গার উপস্থিতি যে কত প্রকট ও তাৎপর্যপুর্ণ তা অনুভূত হয়। বিজয়সেনের 'ব্যারাকপুর তাম্রপট্টে' পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ে 'ঘাসসমভোগভাট্টবরা '[13] নামে একটি গ্রামদানের কথা বলা আছে। দক্ষীণ-পূর্ব, ও উত্তর সীমা জুড়ে 'তিক্ষহন্ড' জলাশয়ের অর্ধাংশ বিস্তৃত রয়েছে অর্থাৎ এখানে তিনদিকে জলা পরিবৃত একটি গ্রামের ভূমিরূপ ফুটে উঠেছে যা 'খাড়ি' , অঞ্চলের (খাড়ি বিষয়ে) ভূপ্রকৃতির সাথে স্বভাবতই সাযুজ্যপূর্ণ। বল্লাল সেনের 'নৈহাটি তাম্রশাসনে' প্রদত্ত বাল্লহিথা গ্রামের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ সীমা বেষ্টন করে রয়েছে 'সিঙ্গাটিয়া' নদী। এই নদীর অপর পারে অবস্থিত আরও তিনটি গ্রাম- ১.অম্বয়িল্লা. ২.নাডিচা. ৩.খন্ডয়িল্লার নাম লেখতে মেলে, যা স্থানীয় ভূমিরূপে নদীর উপস্থিতি এবং নদী মাতৃক গ্রামীণ বসতি বিন্যাসের একটুকরো ছবি তুলে ধরে । এছাড়া 'লক্ষণ সেনের' 'অনুলিয়া তাম্রপট্টে' পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে প্রদত্ত গ্রামের সীমানায় 'জলপিল্লা' (জলধারা) 'তর্পন দীঘি তাম্রপট্টে' প্রদত্ত গ্রাম সীমায় ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাধীন একটি 'পুষ্করিণী' (পুকুর) এবং একটি 'পাকুন্ডি'[14] (পুকুর)। কেশব সেনের ' এদিলপুর তাম্রপট্টে' প্রদত্ত ভূখণ্ডে উৎখনন করা একাধিক 'পুষ্করিণী' ইত্যাদি জলীয় ভূমিরূপের উল্লেখ মেলে। বাংলা তথা পূর্ব ভারতীয়

ভূমিরূপের নদী মাতৃকতার অন্যতম প্রধান স্বীকৃতি মেলে পাল রাজা প্রথম মহীপালের 'বানগড়' তাম্রপট্টে উল্লেখিত 'দেশ-প্রাচী-প্রচুর-পয়সী'[15] শব্দবন্ধটীতে যেখানে পয়ঃ তথা জলরাশি বা জল সম্পদের প্রাচুর্যের কথা এক লপ্তে প্রমান হয়ে যায়।

আলোচ্য সময়ে বাংলার লেখমালা থেকে জলীয় ভূপ্রকৃতি বোধক যে শব্দ গুলির উল্লেখ মেলে সেগুলি হল – গঙ্গা, (নৈহাটি, এদিলপুর, অনুলিয়া, গোবিন্দপুর, বানগড় তাম্রপট্টে উল্লেখ মেলে) ভাগীরথী,(মুঙ্গের, ভাগলপুর তাম্রপট্টে) কোঙঠীয়া (খালিমপুর তাম্রপট্টে) সিঙ্গাটিয়া (নৈহাটি তাম্রপট্টে), জোলক (খালিমপুর তাম্রপট্টে), বেসানিকা (খালিমপুর তাম্রপট্টে), নিচডহারা পুস্করিনি (তর্পনদীঘি তাম্রপট্ট), নন্দীহরি পাকুন্ডি (তর্পনদীঘি তাম্রপট্ট), জলপিল্লা (অনুলিয়া তাম্রপট্ট), স্রোত, আর্দ্রস্রোতিকা, গঙ্গিনিকা, আলী (খালিমপুর তাম্রপট্টে) উল্লেখ মেলে।

বাংলার আলোচ্য পর্বের লেখমালাতে মূলত ভূমিরূপের সীমানা নির্ধারক বা সূচক রূপে বিভিন্ন বৃক্ষের নাম উল্লেখ রয়েছে। এগুলির মধ্যে কাষ্ঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে বটের উল্লেখ প্রায় বেশিরভাগ লেখমালাতেই রয়েছে। ফল গাছের তালিকায় আম, কাঁঠাল, নারকেল, খেজুর, জম্বু(জাম) গাছের কাথা পাই। অর্থকরি ফসলের মধ্যে সুপুরি, চন্দন গাছের উল্লেখ মেলে। বনজ ভূপ্রকৃতির কথা সরাসরি লেখমালায় অরণ্য শব্দ ব্যবহার দ্বারা বোঝা যায়। বন এর প্রসঙ্গে সরাসরি চন্দন বন[16] ও 'তালবনের'[17] কথা পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে তমাল, কেতকি ফুলগাছ, বসসিয়াল্যাটিফোলিয়া(ফুলগাছ), শাকপাতা, ঘাস, পশুচারণভূমি, পুটী প্রভৃত বৃক্ষের উল্লেখ লেখমালা থেকে পাওয়া যায়। তাই সার্বিকভাবে এক বৈচিএময় স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপস্থিতি ফুটে ওঠে। সর্বোপরি নদী, খাটিকা,'জোলক','পুস্করিণী, ইত্যাদি জলীয় ভূপ্রকৃতি বা গ্রাম্যপথ ইত্যাদির ন্যায় বৃক্ষকেও (বন বা একক বৃক্ষ) যে ভূমির সীমানা নির্ধারক হিসাবে লেখমালাতে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে তা থাকে স্থানিয় ভূমিরূপে বৃক্ষের বিশেষ উপস্থিতিগত গুরুত্ব ফুটে ওঠে। বৃক্ষও যে স্থানীয় জনমানসে স্বীকৃত হত তা বোঝা যায়।

আলোচ্য পর্বের লেখমালাতে উচ্চভুমি প্রসঙ্গে 'হিমালয়', 'রোহিতাগিরি', ' মুদ্গাগিরি', 'গোল্ডেন ক্রউনচ', প্রভৃতি পাহার পর্বতের কথা লেখমালায় কখনও সীমানা সূচক হিসাবে আবার কখনও অন্যতর আলোচনার মাধ্যমে ফুটে উঠে। এছাড়াও অনান্য ভূমিরূপ প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপুর্ন শব্দ লেখমালা থেকে চয়ন করা হয়েছে যথা – 'বাঘপখিরা',[18] 'খেটাংগপাল'[19] (ছোট কুড়ে ঘড়) গোপথ, এই 'বাঘপখিরা' শব্দটি বন্যপ্রাণী বাঘের কথা উল্লেখ করছে লেখমালায় এমনটি স্পষ্ট নয় । প্রসঙ্গত লেখমালাতে স্থানীয় তথা আঞ্চলিক ভূমিরূপে যে খন্ডচিএ গুলি নমুনা রূপে প্রতিবিম্বিত হয়। সেখানে প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে মিশে থাকে মনুষ্য নির্মিত উপাদান সমূহ। গ্রাম রাজপথ বা গোপথের সাথে বন বা বৃক্ষ হয়ে ওঠে সীমানার সূচক, নদী বা ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক জলধারার সাথে একই বর্ণনায় মনুষ্য নির্মিত খাল বা পুস্করিণী সহাবস্থান ধরা পরে অভিন্ন সীমানার অনুষঙ্গে। কাজেই শিরোনামের অভিগমন অনুসারে আলোচ্য সন্দর্ভের যেমন বাংলার প্রাকৃতিক ভূমিরূপের বিনির্মিত চিএ মুখ্য আলোচ্য হিসাবেই ফুটে ওঠে। তেমনই ভূপ্রকৃতির বুকে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগীদে গড়ে-পীঠে নেওয়া পরিবেশের পরিবর্তন গুলিও উপেক্ষিত থাকে না।

তথ্যসূত্র

[1] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত, কলকাতা প্রগেশিভ পাব্লিশার্স, প্রথম প্রকাস-২০০০, পৃষ্ঠা-০৩*

[2] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *পাল সেন যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮২,পৃষ্ঠা-২৪

[3] রমারঞ্জন মুখার্জি এবং শচীন্দ্র কুমার মাইতি,*করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশান্স বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেসন অফ বেঙ্গল, কলকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রেস,* প্রথম প্রকাশ , ১৯৬৭, (সম্পূর্ণ বইটি কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে)

[4] ননী গোপাল মজুমদার, *ইন্সক্রিপ্সান্স অফ বেঙ্গল,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, নতুন সংস্করন,২০০৩ , (সম্পূর্ণ বইটি কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে)

[5] এফ.কিল.হর্ন, *খালিমপুর প্লেট অফ ধর্মপাল,* এপিগ্রাফিয়া ইন্ডীকা, ভলিউম ৪, নিউ দিল্লি, এ.এস. আই, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-২৫৩(স্রোত, আলি, জোলক শব্দের উল্লেখ এই লেখতে মেলে)

[6] রমারঞ্জন মুখার্জি এবং শচীন্দ্র কুমার মাইতি,*করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশান্স বিয়ারিং অপ্ন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেসন অফ বেঙ্গল, কলকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রেস,* প্রথম প্রকাশ , ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-১০৮

[7] ননী গোপাল মজুমদার, *ইন্সক্রিপ্সান্স অফ বেঙ্গল,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, নতুন সংস্করন,২০০৩ , পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯(লেখতে এই নদীর উল্লেখের সংখ্যা ৩ বার)

[8] 'জোলক' শব্দটি ছোট নদী অর্থে ব্যবহিত হয়েছে।

[9] 'আলি' শব্দটি ছোট নদী অর্থে ব্যবহিত হয়েছে।

[10] ননী গোপাল মজুমদার, *ইন্সক্রিপ্সান্স অফ বেঙ্গল,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, নতুন সংস্করন,২০০৩ , পৃষ্ঠা -১০৮

[11] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১৬, পৃষ্ঠা -১০

[12] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১৬, পঙতি -২৫-২৬, 'ভাগীরথী- প্রবওমান- নানাবিধ- নৌবাটক- সম্পাদিত- সেতুবন্ধ নিহিত- শৈল শিখর শ্রেণী বিভ্রমাত....'উক্ত লাইনে এ শব্দের উল্লেখ মেলে

[13] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১৬, পৃষ্ঠা -৬৩

[14] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১০, পঙতি -৩৫

[15] রমারঞ্জন মুখার্জি এবং শচীন্দ্র কুমার মাইতি,*করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশন্স বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেসন অফ বেঙ্গল,* কলকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রেস, প্রথম প্রকাশ , ১৯৬৭, প্র থম মহীপালের বানগড় তাম্রপট্টে পঙতি -২১

[16] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-২৮, পঙতি -২২ (লেখমালায় চন্দনেষু শব্দবন্ধের প্রয়োগ মেলে)

[17] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১৭, পৃষ্ঠা -১০৮

[18] ননী গোপাল মজুমদার, *ইন্সক্রিপন্সসঅফ বেঙ্গল,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, নতুন সংস্করন,২০০৩ , পৃষ্ঠা- ১৬৩

[19] তদেব ইন্সক্রিপশন্স নং-১৭, পঙতি -৩০